OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 08*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 64 - 72*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 64 - 72*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848*

# কবি মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে শোষক ও শোষিতের চিত্রণ

অর্পন ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : arpanghosh2500@gmail.com

***Received Date*** *20. 12. 2024*
***Selection Date*** *01. 02. 2025*

***Keyword***
*Social picture, Chandimangal, picture of exploiters and exploited by political-economic-religion in society, the position of women in society.*

***Abstract***
*In Bengali literature, the origin of 'Mangal Kavyas' is based on the greatness of non-Aryan gods and goddesses. In ancient India, which was built on the basis of Aryans and non-Aryans, the dominance of the Aryans can be observed. Bengal was no exception in India. Over time, many colors of the social picture started to change with the evolution of a new era. It is recorded in the pages of history and literature of that time. After the Turkish invasion in the 13th century, we got to know the new culture of Bengal in the social portrait of Mangalkavya. It was a meeting ground of Arya and non-Arya culture. Chandi, Durga, Sheetala, Kalika, Mahamaya were considered as the wives of Shiva. The neglected non-Aryan goddesses Chandi, Manasa, Kalika became anxious to be worshipped by the elite community. Day after day the Mahatmya Geet of the Goddesses was sung. The goddesses were worshipped. At the root of the division between Arya and Anarya was patriarchy and matriarchy, Shiva and Shakti. For a long time, the caste Hindus had ignored the so-called lower-class people and the gods. But the question remains, did the neglected non-Aryan people get their due respect? Or did they remain in the left corner of society (one corner of society) like the worship of the left hand of Chandrasadagar. That is, they remained in the real whale. To find the answer to this question, one has to turn the pages of literature with the help of contemporary history. When one looks at the position of this neglected or deprived people, the first thing that comes to mind is the political, economic andreligious system of governance of contemporary society. From this system of governance, two classes emerge in society. One, the ruling class and the other, the exploited class. The main theme of our article is to draw "The depiction of the exploiter and the exploited in the poem 'Chandimangal' by poet Mukundaram".*

## Discussion

কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল’ কাব্যটি রচনাকাল নিয়ে নানা মতপার্থক্য রয়েছে। কবির গ্রন্থে কালজ্ঞাপনের পরিচয় কয়েক ছত্রে পাওয়া যায় -

"শকে রস রস বেদে শশাঙ্ক গণিতা
কতদিনে দিলা গীত গাইল মুকুন্দ।"[১]

পণ্ডিতমহলে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল বিতর্ক থাকার সত্ত্বেও ষোড়শ (প্রায় ১৫৪৪ - ১৬০০ খ্রীঃ) শতকের রচনা বলে গণ্য করেন। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনি – আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড। প্রথমটিতে কালকেতু-ফুল্লরার আখ্যান এবং দ্বিতীয়টিতে ধনপতি-শ্রীমন্ত-খুল্লনার কাহিনি বর্ণিত। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ। বর্ণিত কাহিনিতে সমাকালীন বাস্তব সমাজ চিত্রেরই রূপায়ণ। সুতরাং কাহিনি বয়নে ও চরিত্র চিত্রণে কবিকঙ্কণ যে জীবনরস-রসিকতা ও জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশ্নাতীত। জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, সেই দৃষ্টিই ছিল তাঁর কাব্যের মূলধন। তাই কাব্যে কবির আত্মপরিচয়ে যে বিবৃত পাওয়া যায়, তাতে সেকালের রাজনীতির ভায়বাহ রূপ পরিলক্ষিত। রাষ্ট্রিক উত্থান-পতন, ভাঙাগড়া, উপদ্রব, অত্যাচার ও ঝড়ঝঞ্ঝায় রাজ্য বিপর্যস্ত। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পাঠান কররানীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠান রাজত্বের অবসান ঘটে, মুঘল রাজত্বের সূচনা ঘটে। এই সময় দিল্লির সম্রাট আকবর রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনে গৌড়, বঙ্গ, উৎকলের সুবেদার হিসেবে নিযুক্ত করেন মানসিংহকে। সম্রাট আকবরের প্রিয়পাত্র ছিলেন মানসিংহ। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্ব শত্রু বারভূঁইঞাদের দমন করে আকবরের রাজ্যবিস্তার করা। রাজা তোডরমল্ল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে তৈরি করেছিলেন 'সুবেবাঙ্গালা'। সেই 'সুবেবাঙ্গালা'র একটি পরগণা ছিল 'সুলেমাবাদ', মুকুন্দের কাব্যে যা 'সিলিমাবাজ' নামে পরিছিত হয়েছে। অর্থলোভী রাজা ও তার কর্মচারীদের জোর-জুলুমে প্রজাদের অবস্থা শোচণীয় হয়ে উঠেছিল। জমির নতুন জরিপ ব্যবস্থা করে খাজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জমির দৈর্ঘ্য মাপা হতে থাকলো কোণাকোণি হিসেবে, উর্বর জমির হিসেবে পতিত জমির উপর খাজনা বসালো। এমন সব কত অন্যায়মূলক কর্ম অধর্মী রাজার শাসনে ও তাঁর ডিহিদার সরীপ মামুদের অধীন হয়েছিল। কবির আত্মবিবরণীতে তা স্পষ্ট উল্লেখিত -

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ
অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।"[২]

রাজার আয়ুক্ত কর্মচারীগণ প্রতিনিয়ত প্রজাদের উপর নানা অন্যায়মূলক কর্ম করছে জেনেও, তার প্রতিকার করার চেষ্টা করেননি। বরং রাজ শৃঙ্খলার বাইরে এই নীচ জাতির প্রজারা কোনো বিরোধমূলক কাজ করলে তাঁদের দুর্ভোগের সীমা থাকত না। তা কালকেতুর আক্ষেপ সুরেই প্রকাশিত -

"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি
নিকটে কলিঙ্গ রাজ বড়ই দুর্বার।"[৩]

আবার দেবী চণ্ডীর বচনেও তা স্পষ্ট -

"কোন দেশ হাজার হাজার
পর-পীড়া দেখি লাগে ডর।"[৪]

প্রজাদের এমন শাসনে তাঁদের জীবনে ঘন অন্ধকার নেমে আসে। জীবন-যাপনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অপরদিকে রাজকোষের ভাণ্ডার পূর্ণ হতে থাকলে মামুদ সরীপ রাজকোষের তকমা লাভ করেন। উজির-সরকার-পোতদার-মণ্ডলরা নিজেদের আখের গোছাতে, সহজ-সরল প্রজাদের ঘাড়ের উপর একবারে জোঁক হয়ে বসে পড়েন। রাজ্যের নিয়মানুসারে বিঘা কুড়ি কাঠাতে হয়। অথচ রাজ্যের সরকার বা উজির কোণাকোণি মাপ-জোখা করে পনের কাঠায় বিঘা বলে, জমি প্রজাদের নামে লিখে দিত। এসব অনাচার প্রজারা বুঝতে পারলেও তাঁদের কথা শাসক আমল দেয় না। বরং শাস্তি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, রাজার কাছে নালিশ করে তাঁদের মুখ বন্ধ করত। কারণ রাজস্বের বাড়তি মুনাফা নিজের পকটে যেত। নচেত এমন অনৌচিত্য

কর্ম করত কেন। রাজস্ব আদায়ের সময় আদায়কারীরা পুরো কুড়ি কাঠা অর্থাৎ বিঘা দামে রাজকর নিতেন। সেকালের উত্তম জমিতে বিঘা প্রতি কুড়ি মণ ফসল ফলে। প্রজাদের রাজস্ব দিতে হত উৎপাদিত ফসলের ১/৩ অংশ। পাঁচ বিঘা জমিতে রাজস্ব হত ৩৩-১/৩ মণ। প্রজাদের কাছে পাঁচ বিঘা সমান পঁচাত্তর কাঠায় তার প্রকৃত রাজস্ব হত পঁচিশ মণ ফসল। কিন্তু রাজকর্মচারীরা বলপূর্বক অত্যাধিক যন্ত্রণা দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে প্রায় তেতত্রিশ মণের বেশি ফসল আদায় করতেন। এই বাড়তি রাজস্ব রাজদরবারে না গিয়ে রাজকর্মচারীর পকেট ভরাত। ফসল বিক্রি করে টাকা পেয়ে ভাঙাতে যেতে হত পোতদার বা মহাজনের কাছে। মহাজনও ওঁত পেতে বসে থাকে একটু রস পাবে বলে। প্রজাদের কাছ থেকে মহাজন টাকা প্রতি আড়াই আনা বাটা নিত। আবার টাকা ধার করলে প্রতিদিন এক পাই করে সুদ দিতে হত। এই ভাবে প্রজারা সকলকে ভাগ দিতে দিতে, নিজের ভাঁড়ার শূন্য হয় পড়ে। সার বছরের অন্ন পর্যন্ত কুলাত না। বাড়ির শিশু কাঁদত এক মুঠো ভাতের জন্য। বাড়ির সকলে অনাহারে জল পান করে অর্ধেক দিন কাটাত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এরূপ দুর্ভিক্ষ্যের চিত্র লক্ষিত -

> "তৈল বিনে করি স্নান কেবল উদক পান
> শিশু কান্দে ওদনের তরে।"[৫]

অরাজকতায় পূর্ণ গোটা রাজ্যের চারদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল। প্রজারা ধীরে ধীরে নিঃস্ব হল আর মুষ্টিমেয় ব্যাক্তিদের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। উনবিংশ শতাব্দির প্রবন্ধিক বঙ্কিচন্দ্রের কথা এখানে আমদের স্মরণার্থ -

> "আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলের কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্‌, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকেরই শ্রীবৃদ্ধি নাই।"[৬]

সর্বকালের শ্রমজীবীদের চরম দুর্দশার মূলে রয়েছে রাষ্ট্রের গুরুভার করপ্রথা ও রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত আদায়কারীদের নির্মম অত্যাচার-অনাচার। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ছত্রে ছত্রে তার অভিন্ন চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর। প্রজারা অভাব-অনটনে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে ধান, গরু হাল ইত্যাদি স্বল্প মূল্যে বিক্রি করে অন্য রাজ্যে পলায়ন করত। কিন্তু পেয়াদারের চোখ এড়িয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করাও কঠিন ছিল। আবার প্রবল পরাক্রমী শাসকদের হাত থেকেও নিষ্কৃতি পায়নি। তাঁদের এই নিদারুণ দৃশ্য কাব্যের পশুদের মুখে ধ্বনিত হয়েছে -

> "বজ্র মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে
> ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে তার তুণ্ডে।"[৭]

কবি মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'কালকেতু' চরিত্রটিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রথমে বলবান কালকেতু রোজ পশুর মাংস বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে। পশুরা আপন মাংসের জন্য নিজের শত্রু হয়ে উঠেছে। তাঁদেরকে ব্যাধের অত্যাচারে নিত্য মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হয়। নির্দয় কালকেতুর নৃসংশ অত্যাচার, পশুদের করুণ আর্তনাদে পরিস্ফুটিত -

> "গণ্ডা বলএ আমি বড় দুঃখ পাই
> খড়্গের জ্বালায় মোর মইল দুটি ভাই।
> কপি বলে রায় মোর করম বিশংস
> কালকেতু ঠুঠারে বেচিল মোর বংশ।
> বারসিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান
> ধরণি লোটাইয়া কান্দে করি অভিমান।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 08*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 64 - 72*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

করিল নিধন কালকেতু পরিবার
বিফল জনম মাতা মৃত সুত দার।
রাণ্ড হইআ হরিণী কান্দয়ে উভরায়
পতিসুখহীন হইনু জিতে না জুয়ায়।"[৮]

পশুদের মাংসের জন্য কালকেতু তাঁদের হত্যা করে। সমাজেও উৎপাদকদের ফসলের জন্য অর্থশোষকদের হাতে নিপীড়িত হতে দেখি। 'অর্থই যে অনর্থের মূল' - এই 'অর্থের' (ফসল) জন্য রাজা থেকে পেয়াদা পর্যন্ত সকল শাসকগোষ্ঠীর কাছে প্রজাদের নিষ্পেষিত হয়। কারুর কাছ থেকে মুক্তি পায় না। আর এই শোষকদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে তাঁদের চরমতম দুর্দ্দশা ঘনিয়ে আসে। জীবন হয়ে উঠে বিপন্ন, হারাতে হয় নিজের আত্মীয়-স্বজনদের, কারুর বাবা-কাকা-ভাই বা পুত্রদের। বধুদের বৈধব্যে প্রাণহীন দুরূহ জীবন অতিবাহিত করতে হয়। কালকেতুর মত শোষকরা যেন হয়ে উঠে যমের দোসর। প্রতিবাদের ভাষা যেখানে মৃত্যু সেখানে নীরবে মৃত্যুসম যন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া প্রজাদের কোন গতি ছিলনা। তাই প্রজারা নিরুপায় হয়ে দেবী চণ্ডীর কাছে শাসকদের নিগ্রহ থেকে উদ্ধার হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক শাসনে ও অর্থনৈতিক শোষণের বলে সমকালীন সমাজের পীড়ক ও নিপীড়িতের চিত্রখানি সহজেই উন্মোচিত হতে দেখি। রাজ্যের রাজা হল প্রদেশের সর্বেসর্বা। অন্যায়ভাবে প্রজাপীড়ন হয় রাজ্যের একবারে উপরের স্তর থেকে নীচের স্তর পর্যন্ত (Tup to Bottam)। রাজা আপন কর্তব্য অর্থাৎ প্রজাপালনের কথা ভুলে গিয়ে নাগরিক জীবন - যাপন মশ-গুল থাকেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা একেবারে ভুলে যান। তাঁদের শুধু সময় মত রাজস্ব পেলেই হল। সেই সুযোগে গ্রামের শাসনকর্তারা মোড়লগিরি চালু করেন। ধৃত মোড়লরা তাঁদের শাসন কৌশলে গ্রামবাসীদের নির্যাতনে নাজাহাল করে তুলেন। তাঁদের জ্বালায় কেউ কেউ দেশ ছাড়াও হয়। সহজ-সরল প্রজাদের কাছ থেকে ঠকিয়ে সর্বস্ব আত্মসাৎ করতে চাইতেন। মূর্খ গ্রামবাসীদের মিষ্টি কথা ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করত। এই শ্রেণীর মানুষ সর্বকালের সমাজে রয়েছে। একালেও চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডে, মুরারি শীলের চরিত্রটি এমনই এক কপট চরিত্রের মানুষকে পাই। কবির বর্ণনাতে তার পরিচয় পাওয়া যায় -

"বন্যা বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা-জোখা করে টাকা-কড়ি।"[৯]

মুরারি শীল জমি-জায়াগা দলিলপত্র লেখা-জোখার কাজ করে। গরীব প্রজাদের টাকা ঋণে দিয়ে মোটা সুদে টাকা আদায় করত। এছাড়া প্রজারা টাকা ভাঙাতে এলে প্রতি টাকায় বাটা নিত, এছাড়াও ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কম দাম দেয়। সে টাকা কাল দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সবটুকু আত্মসাৎ করত। আবার সরল প্রজাদের সোনা-রোপার ভাঙানোর সময়ও বাজার মূল্যে না দিয়ে, পরিবর্তে সামান্য কিছু টাকা বা চাল, ডাল দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দামি রত্ন হাসিল করার চেষ্টা করত। আত্মলোভী মুরারি কালকেতুর সাত কোটি দামের সোনার অঙ্গুরি কৌশলী বুদ্ধি সাহায্যে স্বল্প মূল্যে হাতিয়ে নেওয়ার অদম্য চেষ্টা করেছিল -

"একুন হইল অষ্টাপণ আড়াই বুড়ি
চালু ডালি কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।"[১০]

এইভাবে শঠ প্রবঞ্চক মুরারি দিনের পর দিন দীন-হীন প্রজাদের ঠকিয়ে নিজের আখের গোছাতে থাকে। রাজ্যের রাজার দ্বারা প্রজারা একরূপে পীড়িত হয়। আবার রাজ অধীনস্ত কর্মচারীদের নিষ্ঠুর নির্যাতনে গরীব আরও গরীব হয়। এই গ্রমকর্তারা গ্রামবাসীদের সর্বদা নিজের চাকরতুল্য প্রজা মনে করত। দেবী চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু গুজরাট নগরে রাজা হয়ে বসেন। এই নগরে এমনি এক ধূর্ত মোড়ল চরিত্রের মানুষ ভাঁড়ু দত্ত। কপট ভাঁড়ুর ব্যভিচারে সারা গ্রামের মানুষ ব্যতিব্যস্ত। খেটে-খাওয়া প্রজারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাত। সেই ফসল হাটে বিক্রি করলে তবে টাকা বাড়িতে আনতে পারে। কিন্তু দুষ্ট ভাঁড়ু মাগুলিক হয়ে জোরপূর্বক তোলা তো তোলে, এছাড়া প্রজাদের আনা দ্রব্য বিনামূল্যে হাতানোর চেষ্টা

করে। প্রজারা তার কুবুদ্ধি বুঝতে পেরে তাকে কাছে ঘেঁষতে না দিলে প্রজাদের কষ্ট জল করা ফসল এদিক-ওদিক করে নষ্ট করে ফেলে -

"পসরা লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপাড়ি
জত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাঞি দেয় কড়ি।
লণ্ড ভণ্ডে গালি বলে শালা মালা।"[১১]

ভাঁড়ু দত্ত রাজশক্তির অপব্যবহার করে প্রজাদের আনা ফসল বিনামূল্যে না পেলে সমস্ত দ্রব্য লণ্ড-ভণ্ড করে। তারপর অসহায় প্রজাদের ক্রমাগত কিল, লাথি মারতেও ছাড়ে না। ভাঁড়ুর এমন সব অনাচার থেকে প্রজাদের নিষ্কৃতি নেই। তোলার নামে অত্যাচার সে নিরন্তর করে চলে। গ্রামের মানুষ তাঁর জ্বালায় মর্মাহত। শঠ ভাঁড়ু নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য সব রকমের অহিত কাজ করতে প্রস্তুত। রাজা কালকেতু অন্যায় ভাবে ভাঁড়ুর তোলা তুলা ও গ্রমাবাসীদের প্রতি অহেতুক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ফলে ভাঁড়ু সম্রাটের কাছে কালকেতুর নামে মিথ্যে নালিশ জানায় এবং কৌশলী বুদ্ধির সাহায্যে কালকেতুকে একেবারে সর্বশান্ত করে ছড়ে। এই ধূর্ত প্রকৃতির মানুষরা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে নিজের হাতে রাখত। তাঁরা যেমন খুশি প্রজাদের উপর অনাচার পীড়ন করলেও রাজার কান অবদি পৌঁছাতো না। বরং প্রজারা তাঁদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ জানালে, তাঁদের বিবিধ সাজা দেওয়ার পথ তৈরি করে দিতেন। যথা -

"ধূতি খ্যায়া বুল বেটা কোটাল আমার।"[১২]

ধূর্ত ভাঁড়ুর কপটতার ফলে কালকেতুর জীবনে নেমে আসে চরম দুর্দ্দশা। সমকালীন সমাজকাঠামোর যূপকাষ্টে অসহায় প্রজাদের প্রতিনিয়ত লঘু দোষে কখনো বা বিনা দোষে গুরু দণ্ড পেতে দেখা যায় -

"লঘু দোষে গুরু দণ্ড করে নৃপবর।"[১৩]

রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় গড়ে উঠা সমাজের দুর্বলশ্রেণীর মানুষরা সর্বসময় নিপীড়িত হচ্ছে। অর্থলোভী রাজকর্মচারীরা স্বার্থের জন্য সকল ধর্মের পথ ভুলে গিয়ে অধর্মের পথ বাঁধতে দেখা যায়। তাঁদের পদলেহনে গোটা নিম্নশ্রেণীরা নিষ্পেষিত হচ্ছে। ফলত প্রজারা অন্য রাজ্যে পালিয়ে যায়। রাষ্ট্র ভেঙে পড়ে। বৈদেশিকরা সহজে রাজ্য জয় করে। রাজ্যে শুধু রাজা ও প্রজা শাসক ও শোষিত ছিল না, তার পাশাপাশি আরও নানান ভাবে বিবিধ শোষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য অংশে তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ পাওয়া যায়।

সমগ্র পৃথিবীর মানুষ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভিক্ত - নারী ও পুরুষ জাতি। অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে অর্ধেকাংশ নারী। সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থান অবলোকন করলে দেখা যায় উভয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। বলবান পুরুষজাতি সুবিধাভোগের লোভে গোটা নারী জাতির উপর নিপীড়নের কৌশল আঁটতে থাকেন। প্রাচীন যুগে আর্যদের আগমনের পরবর্তী সময় শাস্ত্রবিধিতে নারীদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনা কথা বর্ণিত হয়েছে, তা বর্তমানের সমাজেও অভিন্ন চিত্র দৃষ্টিগোচর। ষোড়শ শতাব্দীতে কবি মুকুন্দরাম একই চিত্র দেখেছেন। মানব দরদি কবি মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমমঙ্গল' কাব্যে সেকথা সুস্পষ্ট। এখানেও প্রথাগত সমাজবিধির নিয়মানুসারে ধর্মের নামে চরমভাবে নির্যাতনের শিকার হতে দেখি অবলা জাতিকে। এখনো সমাজে প্রচলিত সতীদাহপ্রথা, সহমরণ প্রথা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদির ধর্মচক্রে নারীদের প্রতিনিয়ত পুরুষ-সমাজের কাছে শোষিত হতে দেখি। নারীদের কলঙ্কের আরোপ দিয়ে প্রচলিত সতীদাহ ও সহমরণ প্রথাগুলি সর্বকালের ন্যায় একালেও সমাজে এক ঘৃণ্যতম ঘটনা। ধর্মের নামে এমন ব্যভিচার অত্যাচারেরই নামান্তর। ষোড়শ শতকে সে দৃশ্য ব্যতিক্রম ছিলনা। কাব্যে কলিঙ্গ যুদ্ধের বর্ণনাতে সেকথা স্পষ্টাকারে বলা রয়েছে -

"জেই জন মৈল তোমা সনে করি রণ
অনুমৃতা হইতে জায় তার নারীগণ।"[১৪]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 08
Website: https://tirj.org.in, Page No. 64 - 72
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আবার দেবী চণ্ডীর কথাতেও সুস্পষ্ট -

"দুই কুলে দিয়া বাতি জীবন তেজিল সতী
পতির অনলে ছায়াবতী।"[১৫]

সমাজে সহমরণ প্রথার মত বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহও পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের যেন নির্যাতনের এক এক পন্থা। পরিবারে, বহুবিবাহের ফলে সমাজে নারীদের অবমাননা বাড়তে থাকে। কামুক পুরুষ অধিক বিবাহে আসিক্ত। ফলত অনেক পত্নীরা স্বামীর কাছে নিপীড়িত হতেন। স্বামীর ভালোবাসা হাসিল করার লোভে অনেক সময় নারী হয়ে নারী বিদ্বেষী রূপ ধারণ করেন। গড়ে উঠে সতীন সম্পর্ক। নারী হয়ে নারী নির্যাতন শুরু হয়। এইরূপ অত্যাচারের কথা আখেটিক খণ্ডে ফুল্লরা কথায় দেবী চণ্ডীর বক্তব্যে ফুটে ওঠে। আবার বণিক খণ্ডে খুল্লনার প্রতি লহনার অমানবিক আচারণে তা জাজ্বল্যমান-

"চুল ধরে কিল লাথি মারে তার পিঠে
জৈষ্ঠ মাসে গোহালা গোহালি জেন পিটে।
খুল্লনা জতেক দেই সাধুর দোহাই
অনাথ দেখিআ লহনার দয়া নাই।"[১৬]

আবার -

"দারুণ সতিনী লহনা বাঘানী
কেবল যমের যন্ত্রণা।"[১৭]

নারীদের সম্মান সমাজে ধীরে ধীরে খর্ব্ব হতে থাকে। মনু শাসিত সমাজ থেকে আমরা দেখে আসছি সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী বংশ পরম্পরায় পুরুষরা পায়। ফলত, কন্যা সন্তানের বদলে পুত্র সন্তান মান বেশি। অনেক ধর্মশাস্ত্রে বলা আছে পুত্র সন্তান ছাড়া পিতা-মাতার স্বর্গলাভ অসম্ভব। তাই সমাজে পুত্র সন্তানের মান বাড়তে থাকে। এইরূপ বিবিধশাস্ত্র অনুসারে সমাজে নারীদের একচোখে করে রাখে। সেই কারণে নারীদের আজীবন দুর্ভোগ পেতে হয়। কাব্যেও ধর্মকেতুর স্ত্রী কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তান লাভে অধিক পিয়াসী। আবার সেকালের সাধু-সন্তদের 'পুত্রবতী' হওয়ার আর্শীবাদ দিতে দেখা যায় -

"পরাণার হেতু-ভিক্ষা দেহ গো পরাণরক্ষা
অচিরাতে হবে পুত্রবতী।"[১৮]

দুখিনী মায়ের ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম হলে পরিবারবর্গ একভাবে আতঙ্কে থাকে। বড় হলে তাঁর বিবাহকালে এক মোটা অঙ্কের পণ দিতে হবে। আবার সঠিক সময়ে বিবাহ না দিলে সমাজ দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় গোটা পুরুষশাসিত সমাজের শাসনে ও ধর্মের কষাঘাতে নারীদের অবস্থান কেবল নিপীড়িতা হিসেবে।

ধর্মনীতির নিষ্ঠুর শাসনে দুর্বল জাতি চিরতরে পাপ্য অধিকার থেকে শুধু বাদ পড়তেন তা নয়। তাঁদের প্রতি উচ্চকোটি শ্রেণীরা নীচ-হীন অস্পৃশ্য মনে করে পশুসুলভ আচারণও করতেন। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা 'প্রাচীন ভারতীয় শূদ্র' গবেষণা পত্রে জানিয়েছেন -

> "শূদ্ররাই যে ছিলেন সেবকশ্রেণি সে কথা পরবর্তী রচনায় নিহিত আছে মাত্র। কিন্তু এই (মৌর্য) যুগের ধর্মসূত্রে সুস্পষ্টভাবে এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে শূদ্রদের কর্তব্য হলো তিন বর্ণের সেবা করা এবং এই ভাবেই আশ্রিতদের ভরণ-পোষণ করা।"[১৯]

প্রাচীনকালে থেকে সৃষ্ট এই বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নশ্রেণির মানুষদের বঞ্চিত ও নিপীড়িত হতে দেখা যায়। ষোড়শ শতকে দাঁড়িয়ে সমকালীন সমাজে তা অব্যাহত। কাব্যে আমরা দেখি ব্যাধকুলের মত নিম্নজাতিতে জন্মগ্রহণ করা যেন পাপকাজ। অস্পৃশ্য ঘৃণ্য জাতিকে সমাজ কতখানি কুৎসিত নজরে দেখে তা রাজার উক্তিতে ধরা পড়ে -

"ছুঞিতে বা জুয়ার বেটা অতি নিচজাতি
সভা মাঝে বসিআ কথার দেখ ভাঁতি।"[২০]

সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত ধর্মের শাসনে গোটা সমাজ কুসংস্কারের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আর সেই ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষরা চিরকাল নিম্নজাতির উপর কৌশলে অনাচার করে চলছে। এই ধর্মের নামে অত্যাচারের ছবি 'চণ্ডীমঙ্গলে' যত্র-তত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

অনাদিকাল ধরে মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মানুষেরা সমাজ ও সভ্যতাকে দংশন করে আসছে। শাসকশ্রেণী সমাজের বিষবৃক্ষ স্বরূপ। রাজ্যের প্রজাসাধারণ প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনীতির কবলে অবহেলিত, নিপীড়িত ও নির্যাতনের শিকার হয়। ফলত, রাজ্যে সর্বকালের ন্যায় ষোড়শ শতকেও ধনীরা আরও ধনী হয় আর গরীবরা আরো গরীব হয়। সমাজবদ্ধ জীবনে নিপীড়ক ও নিপীড়িতের সংখ্যা সমানুপাতিক। বৈদিক পর্বে আর্য জাতির হাত ধরে যে শোষকশ্রেণীর পথ তৈরি হয়েছিল ষোড়শ শতকের বাঙালির জনজাতির মধ্যে বহু শাখা-প্রশাখা দেখতে পাওয়া যায়। সেকালের শাসক ও শাসননীতির বলে নির্যাতিত শোষিতের অবিকল চিত্র বর্তমান কালেও দৃশ্যমান। সে-কারণে শোষিতদের জীবন হয়েছে আরও বিপদসঙ্কুল, মর্মান্তিক ও ভয়াতুর। কালে কালে তাঁদের রূপের রূপান্তর ঘটলেও গুণগত বৈশিষ্ট অবিকৃত। তাই আজও বিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনি -

"রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের রং বদলায়
দিন বদলায় না।"[২১]

তাই আজকের দিনেও শাসকগোষ্ঠীর হাতে সমজে এই রকম অন্যায়মূলক কর্ম সহজেই চোখে পড়ে। সমাজে এমন বিষবৃক্ষের জাতকে সমূলে উৎপাটন করাই আমাদের দায়-দায়িত্ব। তাই, আমার মনে হয় আলোচ্য নিবন্ধটি তৎকালীন সমাজে তাৎপর্যবহ।

## Reference:

১. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, (সম্পাদনা), কবিমুকুন্দের, *চণ্ডীমঙ্গল,* শরৎচন্দ্র পাল, ইউনাইটেটড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৪০০
২. চট্টোপাধ্যায়, ড. রবিরঞ্জন, (সম্পাদনা), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত, *চণ্ডীমঙ্গল,* চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৬৮
৩. তদেব, পৃ. ১১৩
৪. তদেব, পৃ. ১২৬
৫. তদেব, পৃ. ৬৯
৬. তদেব, পৃ. ৮৯
৭. তদেব, পৃ. ৮৭
৮. তদেব, পৃ. ১১৫

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 08*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 64 - 72*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

৯. তদেব, পৃ. ১১৭
১০. তদেব, পৃ. ১৪৪
১১. তদেব, পৃ. ১৪৮
১২. তদেব, পৃ. ১৬৩
১৩. তদেব, পৃ. ১৭২
১৪. তদেব, পৃ. ৭৫
১৫. আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার, (সম্পাদনা), কবিমুকুন্দের, *চণ্ডীমঙ্গল,* শরৎচন্দ্র পাল, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০২০, পৃ. ২৪০
১৬. তদেব, পৃ. ২৪১
১৭. চট্টোপাধ্যায়, ড. রবিরঞ্জন, (সম্পাদনা), কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত, *চণ্ডীমঙ্গল,* চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৭৫
১৮. তদেব, পৃ. ১৬৪
১৯. শর্মা, রামশরণ, *প্রাচীন ভারতের শূদ্র,* কে পি বাগচী অয়াণ্ড কোম্পানী ২৮৬ বিপীনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২, পৃ. ৯২
২০. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, *শ্রেষ্ট কবিতা,* সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১১৫

## Bibliography:

আহমেদ, অয়াকিল, *বাংলা মুসলমানের শিকড় ও আত্মপরিচয় (মধ্যযুগ),* আহমেদ কাওসার, বইপত্র ৩৮/৪ বাংলা বাজার ঢাকা ১১০০, ফাল্গুন, ১৪২৮

আলীম, এ. কে. এম. আবদুল, *ভারতের মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস,* আহমেদ মাহমুদুল হক মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৭৬

চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *বাংলার বারোভুঁইয়া ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য,* সুধাংশুশেখর দে, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৩, মাঘ, ১৪২৯

চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, *আদি-মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* বিকাশ সাধুখাঁ, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯

দাস, অপু, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ: *নারীবাদী পাঠ, অবনীন্দ্রনাথ বেরা,* বাণীশিল্প, ১৪এ টেমার লেন কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০২১

ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ, *বাঙ্গলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র পাল বি, এ, কলিকাতা বুক হাউস, ১/১ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, ১৩৪৬

ভদ্র, গৌতম, *মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ,* সুবর্ণরেখা প্রাইভেট লিমিটেট পক্ষে ৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড কলিকাতা-০৯, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪২০

মজুমদার, অরুণকুমার,*প্রাচীন জরীপের ইতিহাস,* নেপালচন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারাবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৪০২, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

রায়, ড. মিহির কুমার,*ভারতের ইতিহাস আদি মধ্য ও মধ্য (তুর্কো-আফগান) যুগ ৬৫০-১৫৫৬,* শ্রীনিতাইচন্দ্র ভক্ত ৩৩ কলেজ রো কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৬

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 08*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 64 - 72*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

সিনহা, গোপাল চন্দ্র,*ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ (প্রথম খণ্ড),* শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং ৩, মুক্তরামবাবু লেন কলকাতা-৭ থেকে মুদ্রিত, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট, ২০১৫

হাবিব, ইরফান, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ মার্কসীয় চেতনার আলোকে,* অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭৩

হাবিব, ইরফান, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা,* সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদক) শ্রী কমল মিত্র কর্তৃক প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স-এর পক্ষে ৩৭ এ, কলেজ স্ট্রীট, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ,১, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-২০ এবং কলকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং নারায়ণ প্রিন্টিং ৩, মুক্তরামবাবু লেন কলকাতা-৭ থেকে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্কারণ : সেপ্টেম্বর, ২০০৯

**পত্র-পত্রিকা :**

তবু একলব্য, *মঙ্গলকাব্য বিশেষ সংখ্যা,* অধ্যাপক ড. সনৎকুমার নস্কর ড. দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পাদনায়), দি গৌরী কালচারল এণ্ড এডুকেশনাল অয়াসোসিয়েশান সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র, বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৩ ক্রমিক ৪৫ 2nd Edition: june 2002, ISSN 0976-9463